একটি আইভরিয়ান মেয়ের রক্তদান

কাজী জহিরুল ইসলাম

সঙ্গত কারণেই আমি মেয়েটির নাম উল্লেখ করছি না। উচ্ছল এক তরুণী। আমাদের স্থানীয় সহকর্মী। বয়স একুশ/বাইশ বছর। টিপিক্যাল আইভরিয়ানদের চেয়ে ও খানিকটা খাটো, গায়ের রঙও ততোটা কালো নয়। সিঁড়িতে দেখা হলো, আমি যখন ক্যাফেটারিয়ায় যাচ্ছি এককাপ ধুমায়িত কফির সন্ধ্যানে। ওর মুখে সকালের ঝলমলে রোদ। মাথার শত বিনুনি দুলিয়ে বললো, ব্লাড ডোনেট করতে যাচ্ছি।

'স্বেচ্ছাসেবক হোন, রক্ত দিন, জীবন বাঁচান' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আইভরিকোস্টের ইউনাইডেড নেশনস ভলানটিয়ার (ইউএনভি) প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীর মতো একটি মহৎ এবং অতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। আজ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৬। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচী। কর্মসূচীটিকে প্রয়োজনীয় বলছি এজন্য যে, মিশনের প্রকিউরমেন্ট কমিটির একজন মেম্বার হবার সুবাদে আমি জানি এই দেশে কর্মরত জাতিসংঘের দেশি-বিদেশি কর্মচারি-কর্মকর্তাদের জীবন বাঁচাতে রক্তের কতো প্রয়োজন। দু'সপ্তাহ আগে প্রকিউরমেন্ট কমিটির এক মিটিংয়ে আমাদের চিফ মেডিকেল অফিসার, ডাক্তার মইসকে দেখেছি এক প্রাণান্তকর যুক্তিযুদ্ধে নেমেছেন কমিটিকে কনভিন্স করতে, কেন রক্ত কেনার ব্যাপারে সম্পুর্ণ প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়াটি মানা সম্ভব হয়নি। তোতাপাখির শেখানো বুলির মতো আমাদের বিজ্ঞ সদস্যরা কেবল মন্তব্য করে যাচ্ছেন, পুরো নিয়ম মানা হয়নি, কাজেই এটা পাশ করা যাবে না। একমাত্র আমিই বলেছিলাম, রক্ত কেনার ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে। আমি সবসময় একটা কথা বিশ্বাস করি, মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। আমি জানি আমার এই মন্তব্য কোট করা হবে। এবং এজন্য আমি বিপদেও পড়তে পারি। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য যদি বিপদে পড়তে হয়, সেই বিপদে আমি স্বানন্দেই পড়তে চাই।

সকালের রোদটা যখন এসি রুমের ভার্টিকেল ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে এসে গালের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন আমার কাছে আলো-ছায়ার এই খেলাটি বড় অদ্ভুত লাগে। ক্যাফেটারিয়ার বিশাল জায়েন্ট সাইজের কাচের উইন্ডোগুলোতে লাগানো ভার্টিকেল ব্লাইন্ডগুলো এজন্যই আমার খুব পছন্দ। এসপ্রেসোর ছোট্ট শাদা কাপটি হাতে নিয়ে যখন দ্বিধার দোলায় দুলছিলাম, রক্ত দিতে যাবো কি যাবো না, তখন ক্যাফেটারিয়ায় এসে ঢুকলেন প্যাট্রেসিয়া ভিকা, ইউএনভি প্রোগ্রাম ম্যানেজার। মরিশাসের এই মহিলা তেমন ভালো ইংরেজী বলে না কিন্তু ওর মনটি দ্বীপদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সমুদ্রের হাওয়ার মতোই খোলা। দেখা হলেই ইংরেজী ফ্রেন্চ মিলিয়ে এক অদ্ভুত ভাষায় অভিবাদন জানাবে, কুশল

জিজ্ঞেস করবে। আজ ওর কণ্ঠে কিছুটা অভিমান, কী ব্যাপার, তুমি যে এখনো এলে না? সুঁই দেখলেই যে আমার মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা হয় একথা আমি ওকে কিভাবে বোঝাই?

আজ আমার গাড়ি নেই। কাজেই লাঞ্চেও যাওয়া হয়নি। বিকেলে একটু আগে-ভাগেই বেরিয়ে পড়লাম। দেখি কাউকে পাওয়া যায় কি-না লিফটের জন্য। বরাবরের মতো সামনের গেইট দিয়ে না বেরিয়ে সেব্রোকোর পেছনের গেইট দিয়ে, যেখানে একটা মস্ত বড় পাহাড়ি শিমুল ছাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওখান দিয়ে বেরুলাম। শিমুলতলায় কি কেউ কাঁদছে? দুই হাঁটুর নিচে মাথা গুঁজে কে যেন বসে আছে। আমার কি এগিয়ে যাওয়া উচিত? আমি এগিয়ে যাই। ওমা এতো সেই মেয়ে, সকালে যে উদ্ভাসিত হাসিতে ঝলমলে রোদ খেলিয়ে রক্ত দিতে গেল। আমি ওর নাম ধরে ডাকলাম। ও মাথা তুললো, ঘাড় ঘোরালো। তাকালো আমার দিকে। মেয়েটির দু'চোখ ঝাপসা। সেই ঝাপসা চোখে ও কি আমাকে চিনতে পারছে? বললাম, চিনতে পারছো, আমি কাজী। ও তখন প্রায় শব্দ করে কাঁদতে শুরু করলো। ও-ওকি আমার মতো সুঁই দেখে ভয় পেয়ে গেল নাকি? কিন্তু সে-তো কোন সকালের কথা। জিজ্ঞেস করলাম, রক্ত দিয়ে ভয় পেলে নাকি? মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। বললো, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে? ওকে খুব অসহায় লাগছে। এইরকম পরিস্থিতিতে কাউকে 'না' বলা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু আমি নিজেই আজ খোঁড়া মানুষ, গাড়ি নেই। ওকে পৌঁছে দিই কি করে? বললাম, চলো।

একটা রেড ট্যাক্সি নিলাম। এই শহরে দুই ধরণের ট্যাক্সি আছে। লাল আর হলুদ। হলুদ ট্যাক্সিগুলো বাসের মতো। একজন একজন করে যাত্রী তোলে, তারপর সবাইকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। লাল ট্যাক্সিগুলো প্রাইভেট, রিজার্ভ খেপ মারে। লাল ট্যাক্সিতে বসে মেয়েটি বললো, ওরা আমার রক্ত নেয়নি? আমি বললাম, কেন হিমোগ্লোবিন কম? এতে মন খারাপের কি আছে। তুমি বেশী করে কলিজা খাবে। হিমোগ্লোবিন বেড়ে যাবে। মেয়েদের রক্তে হিমোগ্লোবিন একটু কমই থাকে। ও বললো, না, আমার রক্তে এইচআইভি আছে। আমি আঁতকে উঠলাম। তবে আমার চমকানোটা ওকে বুঝতে দিলাম না। একটা শুকনো হাসি দিয়ে বললাম, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এইচআইভি বহন করলেই মানুষ মরে যায় না। তোমারতো আর এইডস হয়নি? ও কোন কথা বলছে না। বুঝলাম, আমার এই যুক্তিতে ও তেমন খুশী হয়নি।

যে দেশের ছেচল্লিশ শতাংশ মানুষের রক্তে এইচআইভি সে দেশে এটা কী খুব অস্বাভাবিক কোন ঘটনা? ব্লাড স্ক্রিনিং করতে গিয়ে এমন দু'চারটা কেস যে পাওয়া যাবে এটাতো প্রায় অবধারিত। ওকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছি, জীবনের সব অবধারিত ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। যেমন মৃত্যু। মানুষের জীবনে মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্যি আর কি আছে। সবচেয়ে অবধারিত সত্যের নাম হলো মৃত্যু। আমরা কি সারা জীবন এই সত্যের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে প্রানান্তকর চেষ্টা করছি না?

আমার কেবলই মনে হচ্ছে এই রক্তদান কর্মসূচীটি না আয়োজন করলেই ভালো হতো।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৬